ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 487-494
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.235

নতুন ভোরের সন্ধানে বাজিকরের পথ চলা: প্রসঙ্গ ‘রহু চণ্ডালের হাড়’

ড. অর্পিতা রায় মৌলিক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.12.2025; Accepted: 20.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Abhijit Sen's novel '*Rahu Chandaler Haar*' is a unique creation of Bengali Literature. In this novel, the author introduces the reader to a specific nomadic clan called Bajikar. Bajikar verily refers to rootless nomads. Any thought of stability in life is as if a utopian concept for them. But they do realize the importance of being stable in life. As such, nurturing pure faith in their ancestor Rahu, Bajikars search for their own piece of land that will define their existence. This novel has portrayed this timeless journey of the Bajikars and thereby the readers get introduced to many an episode of history and the-then political scenario. In this sense, '*Rahu Chandaler Haar*' is also a burning documentary of the era. The storyline of the novel has been skillfully woven within a temporal frame that starts a bit before the partition of the country and culminates roughly in the middle of the twentieth century; thus, depicting the societal, historical and political situation of that period.

Along with various stories, myths, beliefs, traditions prevalent among them, Abhijit Sen's narrative beautifully pictures the Bajikar's struggle for existence and their quest for a new dawn. The present discussion is an attempt to highlight this religion-less, land-less Bajikar's life-long journey towards preserving its existence.

Keywords: Bajikar, Journey, Myths, Rootless, Existence, Stability

অভিজিৎ সেনের লেখা *‘রহু চণ্ডালের হাড়’* এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের উপন্যাস। যদি আমরা ভাবি যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবেই অভিজিৎ সেন একে সৃজন করেছেন তবে সেই ভাবনা হয়তো কিছুটা একপেশে দোষে দুষ্ট হবে। নিঃসন্দেহে এখানে এক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও অনেক কিছু। আর সেই অনেক কিছুই এই উপন্যাসের মূল ভিত, যা তাকে এনে দিয়েছে এক স্বাতন্ত্র্য। তারাশঙ্করের *‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’* বা অদ্বৈত মল্লবর্মণের *‘তিতাস একটি নদীর নাম’* এর সঙ্গে এই উপন্যাসের আপাতভাবে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও তা একান্ত ভাবেই বাহ্যিক। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে এমন এক শ্রেণির মানুষদের নিয়ে যাদের সঙ্গে শুধুমাত্র জড়িয়ে আছে ‘নেই’ নামক শব্দটি। সঙ্গত ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে এই শব্দটি কোন্ না থাকার দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছে। আর এই উত্তর খোঁজার দায় থেকেই উপন্যাসে উঠে এসেছে বাজিকর নামের এক শ্রেণির কৌম মানুষদের জীবন সংগ্রামের কথা। তাদের নিজস্ব সমাজ থাকলেও সেই সমাজেও থাবা বসিয়েছে অস্তিত্বের বিপন্নতা। কারণ তাদের নেই কোন ধর্ম, নেই কোন স্থায়ী ঠিকানা। তাই সমাজের মূল স্রোতে বড় বেমানান এই বাজিকর, যা তাদের মধ্যে তৈরি করে এক অস্তিত্বের সঙ্কট। এই উপন্যাসের প্রতিটি পর্বেই অভিজিৎ সেন বাজিকরদের সেই বিপন্নতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসের আখ্যান শরীরকে ছুঁয়ে গেছে দেশ ভাগ ও তার পরবর্তী সময়পর্বের সামাজিক অবস্থার কথা। বাজিকর নামের এই যাযাবর মানুষদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এইসব বিষয়গুলি পাঠকের সামনে উঠে এসেছে। নির্দিষ্ট কোন চরিত্রকে প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে তার কাঁধেই উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখানে লেখক কখনোই চাপান নি। প্রারম্ভিক পর্বে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলা এই উপন্যাসে যে সকল চরিত্র খুব গুরুত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পীতেম বাজিকর। কিন্তু কাহিনিস্রোত বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর উপন্যাসের জোয়াল যারা নিজের কাঁধে তুলে নেয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পরতাপ ও জামির। আর শেষ পর্বে এসে সেই ভূমিকায় যাকে পাওয়া যায় সে ছিল শারিবা, যাকে উপন্যাসের শুরুতেই তার নানি লুবানির কাছে বসে নিজের পূর্বপুরুষদের কাহিনি শুনতে দেখা যায়। বস্তুত লুবানি ও শারিবার এই আলাপচারিতার সূত্র ধরেই পাঠক ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় বাজিকরদের অন্দরমহলে, পরিচিত হয় বাজিকরী দুনিয়ার সঙ্গে। তবে এই সব কয়টি পর্বে যার নীরব উপস্থিতি আমরা প্রায় সবসময় খুঁজে পাই সে হল রহু চণ্ডাল— বাজিকরদের একমাত্র ঈশ্বর, পরিত্রাতা, সকল বাজিকরের একমাত্র আশ্রয়। সব মিলিয়ে বলতে গেলে রহু বাজিকরদের একমাত্র বিশ্বাস ও শক্তি। তাই সেই দিক দিয়ে মনে হয় যে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল সমগ্র বাজিকর সমাজ এবং রহু চণ্ডাল স্বয়ং।

বাজিকর মানেই শেকড়বিহীন এক যাযাবর গোষ্ঠী। তাই উপন্যাসের এক মুখ্য চরিত্র পীতেম যখন বলে "সারা দুনিয়া বাজিকরের। জায়গার অভাব?"[১] তখন আপাত ভাবে সেই কথার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকলেও সত্তার গভীরে কোথাও হয়তো ছিল সংশয়। বাজিকরও আসলে বুঝতে পারত থিতু হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তারা মনে করত যে তাদের স্থায়ী ঠিকানা না থাকার নেপথ্যে রয়েছে দেবতার অভিশাপ। পীতেম ও সলমার সম্পর্কের সূত্র ধরে সেই কাহিনি আমাদের কাছে উঠে আসে—

> "...যখন তাদের কোনো প্রাচীন পুরুষ পুরা এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর শুরু হয় সেই অন্তর্কলহ, যা তাদের স্থায়ী বসবাসকে ছিন্নভিন্ন করে। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি তুলেছিল, এ বিয়ে হতে পারে না, কেননা পালি নামের সেই নর্তকী নাকি তার বোন। সুতরাং এ বিয়ে হবে অসামাজিক এবং অমঙ্গলময়।
>
> পুরার সমর্থকরা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই, কেননা পালি যে পুরার বোন এর কোনো প্রমাণ নেই।
>
> তারপর পালি ও পুরার বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত মানুষ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশদেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ... তারা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ক'রে দেয়। তোমরা এক বৃক্ষের ফল দু'বার খেতে পারবে না, এক জলাশয়ের জল দু'বার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নিচে একাধিক রাত্রি বাস করতে পারবে না এবং সব থেকে ভয়ানক—এক মৃত্তিকায় দু'বার নৃত্য করা দূরে থাকুক, দু'বার পদপাত পর্যন্ত করতে পারবে না।এই ছিল দেবতার অভিশাপ।"[২]

বস্তুত সেই থেকে শুরু হল বাজিকরদের পথ চলা। জীবনে স্থিতির কথা চিন্তা করা তাদের কাছে যেন ছিল এক অলীক ভাবনা। বাজিকরদের এই পথ চলার সূত্র ধরেই ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় পাঠকের সামনে উঠে আসে। সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে *'রহু চণ্ডালের হাড়'* সময়ের এক জ্বলন্ত দলিলও বটে। উপন্যাসে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হয় লুবিনির। নাতি শারিবাকে নিজেদের সমাজের সঙ্গে পরিচয় করানোর মধ্য দিয়ে এই কাহিনির

শুরু। বস্তুত নাতি ও নানির এই ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই পাঠকের সামনে উঠে আসে বাজিকরদের এক সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস, তাদের কয়েক প্রজন্মের ভাবনা। দেশ বিভাজনের বেশ কিছুটা আগের থেকে শুরু করে উপন্যাসটির কাহিনিস্রোত এসে থেমেছে মোটামুটি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালে। আর তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সেই সময়পর্বের সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য—

> "রহু চণ্ডালের হাড় শুধু এক শ্রেণীর যাযাবরের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী নয়। এই যাযাবরগোষ্ঠী, আমার উপন্যাসে যে গোষ্ঠীর নাম বাজিকর, তাদের এক-দেড়শ বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়কার ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বানিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।"[৩]

উপন্যাসটির প্রতিটি পর্বেই রয়েছে বাজিকরদের জীবন সংগ্রামের সুনিপুণ ছবি। কখনো সেই সংগ্রামের নেপথ্যে রয়েছে জীবন যুদ্ধে নিছকই টিঁকে থাকার চেষ্টা, আবার কখনোবা স্থায়ী ঠিকানার জন্য লড়াই। কিন্তু দু'টিই যে ভীষণ কঠিন। কারণ তাদের না আছে কোন ধর্ম, না আছে কোন সামাজিক পরিচয়। উপন্যাসের একটি চরিত্র আকালুর গাওয়া হাপু গান ও তার প্রদর্শন সেই কঠিন লড়াইয়ের কথাই যেন বলে যায়—

> "আকালু সেই তিন বছর বয়স থেকে পৃথিবীর সঙ্গে একা লড়ে যাচ্ছে। ... সেই অবুঝ বয়স থেকেই তার পেশা হাপু গান। হাপু একটি দীর্ঘ ছড়া, গান ও আবৃত্তির মাঝামাঝি একটি সুরে গাওয়া হয়। অনুষঙ্গে থাকে গায়কের হাতের একটি মোটা পাঁচন লাঠি আর মুখ, নাক ও বগল ইত্যাদি নির্গত বিভিন্ন বিকৃত শিৎকার ধ্বনি। গানের সঙ্গে বা সমে লাঠি দিয়ে গায়ক তার সর্বাঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে আঘাত ক'রে শব্দ সৃষ্টি করে। ... গানের শেষ অংশে লাঠির বারি এমন দ্রুত ও ভয়াবহ শব্দ হতে থাকে যে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অনেকসময় ছুটে এসে হাত চেপে ধরে লাঠি কেড়ে নেয়।"[৪]

শারিবা যখন এই বিষয়ে আকালুকে এই প্রবল যন্ত্রণাময় কাজটি করার কারণ জিজ্ঞেস করে তখন আকালু তাকে বলে এক কঠিন সত্যি— "না বারালে মানসি পয়সা দিবে"?[৫]

আসলে বাজিকরের জীবনের প্রতিটি পর্বেই রয়েছে সামাজিক লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। এতেই তারা অভ্যস্ত, তাই এটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক। তাদের কাছে জীবনের একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হল যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকা। জীবজন্তুর খেলা দেখানো থেকে শুরু করে দড়িবাজি, ভেল্কি, লোক ঠকানো বা চুরি করা কোনটাই বাজিকরের কাছে না করার নয়। তাই তারা শুধু ঘর বাঁধে আর ভাঙে। বাজিকরি নসিবের ওপর ভরসা করে রাজমহল, রাজশাহী, মালদা, রংপুর, পাঁচবিবি বহু জায়গাতেই তারা তাঁবু ফেলে। কিন্তু স্থায়ী বাস তাদের কাছে যেন মরিচীকা। পূর্বপুরুষের পাপের বোঝা তাদের কোথাও স্থায়ী ভাবে থাকতে না দিলেও তারাও কিন্তু চায় একটুকরো জমি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পথ চলতে চলতে বাজিকরদের রক্তেও নেমে এসেছে ক্লান্তি আর সেই সঙ্গে তাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে কিছু অনতিক্রম্য সঙ্কট,যার ফলে বাজিকরদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিপন্ন হয়ে পরছে। তাই তারা একসময় সন্ধানে নামে পূর্বপুরুষের নির্দেশিত সেই পুবের দেশের। উপন্যাসের কিছু অংশ এপ্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে—

"ঘুমের মধ্যে তার মরা বাপ দনু আসে তার কাছে।

- পীতেম হে, পীতেম?
- বাপ?
- চোখেৎ পানি ক্যান বাপ?

পথেৎ যামো কেংকা বাপ? দল নষ্ট হোই যাবে, বাপ।

ক্যানে বাপ, তর দুষ্কু কিসের?

-ভইস কই বাপ? ঘোড়া কই বাপ?

হাঁই দেখ, জঙ্গলের ধারে কত গাবাতান ভৈসী ঘুরে বেড়ায়। হাঁই দেখ, কত যোয়ান টাটু ঘুরে বেড়ায়। ওলা সব তুমার। দুনিয়ার বেবাক মাঠেৎ চরা জানোয়ার তুমার।

- বাপ।

- পীতেম, হে পীতেম, পুবের দেশেৎ যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসীব।

- পুবের দেশেৎ?

-পীতেম, হে পীতেম, রহু তুমার সহায় থাকুক।"[৬]

সঙ্গতভাবেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে যে রহু কে? বাজিকরদের দেবতা? না কি তাদের সর্দার? সম্পূর্ণ উপন্যাসেই রহু চণ্ডাল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাস্তবে এই রহু হল বাজিকরদের এক পরম বিশ্বাস, তাদের একমাত্র ভরসার স্থল। রহু তাদের স্বজাতিকে এক সুন্দর জীবন গড়ে দিয়েছিল। তবে সে জীবন স্থায়ী হয় নি। বাইরের পঙ্কিল স্রোত কখন যে তাদের ঘিরে ফেরেছিল তা রঘু বুঝতে পারে নি। শুধুমাত্র তাই নয়, সেই পঙ্কিলতা তার জাতের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে তাকেও করে তুলেছিল কদর্য। যথার্থ দলপতি হিসেবে রঘু তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আত্মত্যাগের। সে যেন হয়ে ওঠে এক অন্ত্যজ দধীচি, উদ্ধার করতে ছোটে তাদের পবিত্র নদী, রক্ষা করতে চায় তার অনুগামীদের। ঘাতকের আস্ত্রাঘাতে রহুর বুক থেকে জলস্তম্ভের মত নির্গত রক্ত তাদের সেই পবিত্র নদীর জলের সঙ্গে মিশে ভাসিয়ে দিল কদর্য মানুষদের। বন্যার শেষে রহুর হাড় কয়টিকে আশ্রয় করে তার অনুগামীরা পা ফেলে এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে। সেই থেকেই শুরু হয় তাদের পুবের দেশের সন্ধান, যেখানে হয়তো তাদের জন্য রয়েছে এক সম্ভবনাময় নতুন সূর্যের ভোর। আর তাই বাজিকররা বিশ্বাস করে "রহু আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের রক্ষা করেন, নতুন ভূখণ্ডে আমাদের সুস্থিতি না করিয়ে তাঁর তো মুক্তি নেই।"[৭]

উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে বারবার একটা প্রশ্ন মনে আসে বাজিকরি রক্ত কি সত্যিই স্থিতি চায়? না কি জীবনের ভ্রাম্যমানতাই তাদের আকৃষ্ট করে? যেমন সালমার কাছে গৃহস্থ হওয়া মানেই যেন বাঁধা জানোয়ার। আসলে স্থিতিশীল হওয়ার জন্য চাই নিজের এক টুকরো স্থায়ী জমি এবং সামাজিক পরিচয়। আর এখানেই রয়েছে মূল জট।কারণ বাজিকরের কোন জাত নেই, তাদের একটা গোষ্ঠী বলা যেতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতের পরিচয় তাদের নেই। পীতেমকে তাই সাঁওতাল সর্দার লক্ষণ সোরেন যখন বলে যে বাজিকর কোন জাত নয় তখন পীতেম তাতে সম্মতি দেয়। তাই যখনই তারা স্থায়ীত্বের আগ্রহ নিয়ে কোথাও হাজির হয় তখনই সমাজ প্রশ্ন তোলে তাদের জাত নিয়ে। তবে জমিতেই যে জীবনের স্থিতি,সেটাই যে জীবনের একমাত্র স্থায়িত্ব সেই অমোঘ সত্যি এক বাজিকরকে সে রাতে বোঝাতে চেয়েছিল লক্ষণ। তার ভাষায় "পুরুষ মানুষের যেমন একজন মেয়েমানুষ চাইই, তেমনি সব মানুষেরই জমিও চাই।"[৮] পাকা ধান যখন গৃহস্থের ঘরে ওঠে, তার গন্ধ যখন চারদিকে ছড়িয়ে যায় তখন এক প্রবল সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। লক্ষণ সেকথাই পীতেমকে সেই রাতে বোঝাতে চেয়েছিল—

> "পীতেম জানবে না আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই নক্ষত্রখচিত রাতে খোলা আকাশের নিচে লক্ষণ সোরেন যে বীজ তার অভ্যন্তরে প্রোথিত করল, তার অধস্তন তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষে সে পল্লবিত হয়ে অনেক সমস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখের জন্ম দেবে।"[৯]

বাজিকরদের সমস্যা এবং তাদের ওপর ঘনিয়ে আসা সঙ্কটের কারণ বহুবিধ। এই আলোচনায় একথা আগেও বলা হয়েছে যে বাজিকরের কোন জাতিগত পরিচয় নেই। তাই হিন্দু, মুসলিম বা অন্য কোন সম্প্রদায়ই

তাদের আপন করে নেয় না। এই কারণে তারা যে শুধুমাত্র সামাজিক ভাবেই নিপীড়নের শিকার হয় তা নয়, বরং আরও বড় এক সঙ্কট তাদের জন্য সৃষ্টি হয়, আর সেটাই একদিন বাজিকরদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে উঠবে বলে তারা মনে করে। সেই সঙ্কট হল জৈবিক দাবী ও বিবাহের প্রয়োজনে স্বজন গমন বা বলা যেতে পারে স্বগোত্রে বিবাহ। কারণ বাজিকরের সঙ্গে কেউই কুটুম্বিতায় আগ্রহী নয়। যখনই তাদের কাছে তাদের জাতের কথা জানতে চাওয়া হয় তখনই তারা নিশ্চুপ হয়ে যায়। আর তাই হিন্দু বা মুসলিম কেউই তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতায় আগ্রহ দেখায় না।বাজিকর যেহেতু কোনো সমাজের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয় ,তাই অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মেয়ের সঙ্গে বাজিকরেরে ছেলের সম্পর্ক তৈরি হলে তার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। মালো সম্প্রদায়ের মেয়ে পাখির সঙ্গে বাজিকর যুবক সোজান এবং নমশূদ্র ঘরের মেয়ে মালতীর সঙ্গে বাজিকর ওমরের প্রণয় তারই প্রমাণ। দুইটি সম্পর্কেরই যবনিকা পতন হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাই নিজেদের মধ্যেই বিবাহ বা সম্পর্ক স্থাপনে তারা কিছুটা বাধ্যই হয়। আর তাই বাজিকর শিবিরে শিশু মৃত্যু বা অকাল মৃত্যুর মত ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ একই রক্তের মধ্যে তাদের বারবার সম্পর্ক ঘটে। মূল গিঁটটা আসলে রয়েছে সমাজের ভাবনায়। তাই জাত হীন বাজিকরকে কেউ নিজের আত্মীয় ভাবতে পারে না, তাদের ওপর বিশ্বাস করতে পারে না। এপ্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি অংশের কথা মনে পড়ে যায় যেখানে পারগানা লক্ষণ সোরেন পীতেমকে তাদের গ্রামে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বাজিকরদের কাছে এ বড় সম্মানের বিষয়, আর সেই সঙ্গে অবাক করে দেওয়ারও। কারণ—

> "বাজিকরকে কেউ কোনোদিন নেমন্তন্ন করে না। তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করার কথা কেউ ভাবে না। লক্ষণ সেই মর্যাদা দিয়েছে তাদের, এ কি কম কথা?"[১০]

সমজে নিম্নবর্গের ওপর উচ্চবর্গের পীড়ন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই উচ্চবর্গ–নিম্নবর্গের সংজ্ঞা কি হতে পারে তা একটি স্বতন্ত্র ও সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয়। তবে খুব সংক্ষেপে এবং সহজ করে বলতে গেলে যাদের সামাজিক অবস্থান বর্ণে ও বর্গে পেছনের সারিতে তারাই নিম্নবর্গ হিসেবে পরিচিত। আমরা একথা প্রত্যেকেই জানি যে বর্ণভেদ প্রথমদিকে শ্রেনি বিভাজনের মাপকাঠি হলেও পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে এই বিষয়টির নির্ণায়ক হয়ে ওঠে বিত্ত। আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মানদণ্ড হয়ে উঠেছে শ্রেণি নির্ধারণের একমাত্র মাধ্যম। আমাদের আলোচ্য 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসেও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। নমোশুদ্রদের দলপতি ভায়রো আর্থিক কৌলীন্যের কারণে হয়ে ওঠে বাইশ দিগরের সর্বেসর্বা। উপন্যাসের কিছুটা অংশ এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যাক—

> "নমোশূদ্ররাও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে জলচল নয়, কিন্তু বাদা-কিসমতের ভৈরব মণ্ডল ইত্যাদি কয়েকজন নমোশূদ্র বেশ বর্ধিষ্ণু এবং দাম্ভিক। ভৈরবের বা ভায়রোর কয়েক পুরুষের রেহানী কারবার, এখনো তেজী। ভায়রো এখনো ঘোড়ায় চড়ে মহালে যায়।
>
> ...
>
> ... সবচেয়ে শক্তিশালী ভায়রো তার সমাজের বাইশ 'দিগর'-এর মাথা।"[১১]

আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে তাই স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যায় যে বর্ণগত, পেশাগত বা গুণগত— এই সবের উর্ধ্বে উঠে অর্থনৈতিক কৌলীন্যের তারতম্যের ওপর সচেয়ে বেশি মাত্রায় নির্ভর করে এই নিম্নবর্গীকরণ। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সুচিন্তিত মন্তব্যটি অবশ্যই উল্লেখ্য—

> "নিচু জাতিতে জন্মানোটা নিঃসন্দেহে বঞ্চনার একটা কারণ। কিন্তু নিচু জাতির লোকেরা যদি দরিদ্র হয়, জাতিগত বঞ্চনা বহুগুন বৃদ্ধি পায়। দলিত বা নিম্নবর্ণের লোকেরা অথবা

> তফসিলভুক্ত আদিবাসীরা যে বঞ্চনা ও বৈষম্য ভোগেন তা অনেক বেশি রকম হয়ে দাঁড়ায় যখন তা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।"[১২]

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসেও এই সামাজিক নিপীড়নের এক বাস্তব চিত্র পাঠক খুঁজে পায়। শুধু যে জাত গোত্র পরিচয়বিহীন বাজিকররাই এই অত্যাচারের শিকার তা কিন্তু নয়, যারা দুর্বল, যারা অবহেলিত তারাই এই নিপীড়নের শিকার। যেমন পারগানা লক্ষণ সোরেনের সূত্র ধরে সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের বাস্তব চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে।কথিত আছে যে সাঁওতাল ধার নিলে তা কোনদিন শোধ হয় না। যেমন মঙ্গল মুর্মুর নেওয়া পাঁচ টাকা ঋণ সারা জীবন বেগার খেটেও সে যে শুধু শোধ করতে পারে নি তা নয়, তার ছেলে সুফলও দয়ারাম ভকতের বাড়ির বাঁধা চাকর হয়ে থেকে যায়। তবে যেখানে পীড়ন সেখানেই প্রতিবাদ। আর তাই পতিত সাউ-এর নিজস্ব পদ্ধতিতে ধানের ওজন করা একসময় সাঁওতালরা আর মেনে নেয় না, এর ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে তা জেনেও তারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। বাজিকররা তো এই পীড়নের তালিকায় সর্বদাই রয়েছে। তারা আসলে এতেই অভ্যস্ত। তবে প্রতিবাদী হতে তারাও জানে। জামির, জিল্লু, রূপা তারই প্রমাণ।

একথা আলোচনায় আগেও বলা হয়েছে যে জাতিগত পরিচয়হীনতা বাজিকরদের বঞ্চনার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। যখনই তারা কোন ভূখণ্ডে স্থায়ী বাস গড়ে তোলে তখনই তাদের সেখান থেকে উৎখাত হতে হয়। সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাজিকর বোঝে যে অস্তিত্বের আরেক নাম পরিবর্তন। তাই তারা পরিবর্তনকে মেনে নিয়েই জীবন যুদ্ধে সামিল হয়। কিন্তু যখনই তাদের কাছে সমাজ জিজ্ঞেস করে যে তাদের ধর্ম কি তখনই তারা হোঁচট খায়। কারণ এই একটা প্রশ্নের কাছে বাজিকর বড় অসহায়। এই একটি বিষয়কে হাতিয়ার করেই বাজিকরকে যেকোনো সময়েই উৎখাত করা যায়, কারণ "যার সমাজ নেই তার সঙ্গে সামাজিক চুক্তিও হয় না।"[১৩] আর তাই ন্যায়নীতি এই সব কিছুকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে পেকে ওঠা ভাদু ধান ঘরে তলার আগেই ইয়াসিন আর রূপার জমি ছিনিয়ে নেওয়া যায়। আসলে বাজিকর শুধু চেনে রহুকে। ওলা মাই, বিগা মাই বা কালীমাইকে তারা তাদের ভ্রাম্যমান জীবনের সূত্রে ধারন করেছে, ঠিক যেমন রপ্ত করেছে বিভিন্ন ভাষা। কিন্তু তাদের একমাত্র ভরসা স্থল হল রহু। তাই নিজেদের ধর্মের বিষয়টি তারা কখনোই গুরুত্ব দিয়ে ভাবে নি। যখন তারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারল তখন অস্তিত্ব রক্ষার্থে তারা যেকোনো জাতের খাতাতেই নাম তুলতে রাজি হয়ে যায়। কারণ যেই ধর্মকেই তারা ধারন করুক না কেন বাজিকর মাত্রই জানে যে তাদের আসল আশ্রয়স্থল রহু। তাই বাজিকর যুবক ওমর যখন নমোশূদ্র মেয়ে মালতীকে নিয়ে পালিয়ে যায় তখন নিজের দলকে বাঁচাতে খুব সহজেই বাজিকর সর্দার ইয়াসিন ভায়রোর কাছে তাদের নমোশূদ্রদের জাতে তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে বসে। আবার এই ভায়রোর কাছেই চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে শারিবা যখন কিসমতের সমাজ প্রধান হাজী খেসেরের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান পায় তখন সে তাদের বাজিকর দলকে রক্ষা করার জন্য এটাই একমাত্র পথ বলে ধরে নেয়। অপর দিকে হাজী খেসেরের কাছেও সামাজিক, রাজনৈতিক সমীকরণের দিক দিয়ে বাজিকরদের ধর্মান্তরিত করতে পারাটা ছিল এক লোভনীয় বিষয়। কারণ বিভাজন পরবর্তী অধ্যায়ে এদেশে তুলনামূলক ভাবে মুসলমান কিছুটা সংখ্যাগত ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই নিজেদের গোষ্ঠীবৃদ্ধির জন্য বাজিকরদের ইসলামে ধর্মান্তরীকরণ করাকে তিনি স্বজাতির প্রতি তাঁর একটা বড় অবদান বলে মনে করেছিলেন। তাছাড়া তিনি জানেন যে

> "একজন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করলে হজ্জের সমান পুণ্য। ... স্বজন কমে গেছে, বাড়বে না, কিন্তু স্বধর্মী বাড়বে।"[১৪]

তবে শারিবার দেখানো পথে অধিকাংশ বাজিকর ধর্মান্তরিত হলেও সে নিজে সে পথের পথিক হয় না। কারণ সে বাজিকর ছাড়া নিজেকে আর কোন ভাবেই ভাবতে পারে না, এই পরিচয়ই সে সত্তার গভীরে বহন করে। এই অংশে হানিফের সঙ্গে শারিবার কথোপকথন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—

"- এটা গোপন কথা কহি, হানিফ ভাই। মহরমের দিন বাজিকর পাড়ার তিন ভাগ মানুষ মোছলমান হবে।

...

- তোমরা মোছলমান হবা?

- তিনভাগ ঘর বাজিকর মোছলমান হবে, এক ভাগ ঘর হবে না

- তুমি কোন্ দলে?

-এক ভাগের দলে।

- এ বুদ্ধি কার?

-বিপদের, পেয়োজনের।

... তুমি ক্যান হবানা?

- হামার বাপ নিজেরে হিঁদু ভাবে।

- তুমি কি ভাব?

- হামি ভাবি বাজিকরের কোনো জাত নাই।"[১৫]

শেষের লাইনটিতে পৌঁছে পাঠক থামতে বাধ্য হয় একজন বাজিকর যুবকের আত্মপ্রত্যয়ের কাছে আর এখানেই আমরা খুঁজে পাই রহু চণ্ডালের যথার্থ এক উত্তরসূরিকে যে হয়তোবা কোনোদিন বাজিকরকে দিতে পারবে যথার্থ পুবের দেশের সন্ধান।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, অভিজিৎ। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ৫।

২। তদেব, পৃ. ১৬-১৭।

৩। সেন, অভিজিৎ। যেভাবে লেখা হল রহু চণ্ডালের হাড়। গল্পপাঠ, ওয়েবজিন, অক্টোবর ২১, ২০১৫।

৪। সেন, অভিজিৎ। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ১৮০।

৫। তদেব, পৃ. ১৮১।

৬। তদেব, পৃ. ৫।

৭। তদেব, পৃ. ৭১।

৮। তদেব, পৃ. ২৭।

৯। তদেব, পৃ. ২৮।

১০। তদেব, পৃ. ৩২।

১১। তদেব, পৃ. ২০১।

১২। সেন, অমর্ত্য। ভারতের শ্রেণি বিভাগের তাৎপর্য। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারি, ২০০৩, ৭০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃ. ৪০।

১৩। সেন, অভিজিৎ। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ১৭৯।

১৪। তদেব, পৃ. ২০৫।

১৫। তদেব, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫।

২। বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন। বাংলার হিন্দুদের বর্ণ বিন্যাস। ডেল্টা ফার্মা, কলকাতা, ২০০০।

৩। ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত)। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।

৪। সেন, অর্ণব। আধুনিকতার নানা স্বর। বইওয়ালা, কলকাতা, ২০০৬।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত আলোচনা:

১। রহু চণ্ডালের হাড়: বহুস্থানিক বর্ণমালায় সমান্তরাল সংস্কৃতি— অংশুমান ভৌমিক
ওয়েবসাইট- https// www.kaliokalam.com

২। বাজিকর গোষ্ঠীর পর্যটন অথবা শাশ্বত মানবের যাত্রা— সাদা কামালী
ওয়েবসাইট- https//bdnovels.org

৩। রহু চণ্ডালের হাড়: বাজিকরের উপাখ্যান— রঞ্জনা বিশ্বাস
ওয়েবসাইট- https//www.chintasutra.com